পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ও পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ পাস-সার্টিফিকেট প্রভৃতি

গত ১২ জুলাই থেকে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ৮৪ হাজার ২১০ জন। কিন্তু পরীক্ষার প্রথম দিনই ঘটেছে পুরনো ঘটনা। পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে ২ হাজার ৬ শ'রও বেশী পরীক্ষার্থী। পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা যায়, প্রতিদিনই নকল তথা অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে আরও বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কৃত হবে ; তাদের শিক্ষা জীবন থেকে মুছে যাবে একটি মূল্যবান বছর।

পরীক্ষায় নকলের এই অপপ্রবণতা দীর্ঘকালের। দীর্ঘকাল ধরেই এই নকল প্রবণতা রোধের জন্য একমাত্র শাস্তির ব্যবস্থা বহাল রয়েছে, তা হল, পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার। এই শাস্তির প্রণেতারা হয়ত ধারণা করেছিলেন যে, এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেই হয়ত পরীক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে এবং কেউ আর কোন দিন নকল করবে না। সকল ছাত্র ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এই শাস্তির ব্যবস্থায় যে আসলেই কোন ফলোদয় হয়নি, হামেশাই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। নকল প্রবণতা শুধু যে সার্টিফিকেট পরীক্ষায়ই সীমাবদ্ধ, তা নয়, ডিগ্রী-ডিপ্লোমা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও আছে নকলের এই প্রবণতা।

পরীক্ষায় নকলের এই প্রবণতা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই সমাজে যে যা পাবার যোগ্য নয়, সে তাই পেতে চায়, যে যা পাওয়ার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারেনি, সে তাই চায়। তারই পরিণতি পরীক্ষায় নকল-প্রবণতা।

কিন্তু কেন যুগ যুগ ধরে পরীক্ষায় পাস করার জন্য, সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী অর্জনের জন্য লেখাপড়ার বদলে নকলের ওপর শিক্ষার্থীদের নির্ভর করতে হচ্ছে? এর কারণ কেউ কখনও খতিয়ে দেখেছে বলে মনে হয় না। সে রকম হলে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে নকল প্রবণতা অবসানের একটা পথ বেরুতো, পরীক্ষায় নকল করার কথা হয়ত কেউ চিন্তাও করত না।

আমাদের বিবেচনায় নকল প্রবণতার মূল কারণ মেধা বিবেচনার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ও মার্কশীটের অত্যধিক গুরুত্বদান। চাকরি বলি, বৃত্তি বলি, সামাজিক অন্যান্য অবস্থান বলি— সকল ক্ষেত্রে পাসের সার্টিফিকেট ও উচ্চ নম্বর এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে যে শিক্ষার্থী পরীক্ষায় প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, সে নকলের আশ্রয় গ্রহণ করে ; আবার যে পারে সে আরও ভাল করার জন্য কখনও অসৎ পথের আশ্রয় গ্রহণ করে।

আবার সার্টিফিকেট বা মার্কশীট নির্ভরতা ছাড়া মেধার বিবেচনাকারীরা লাখ লাখ ছাত্রের মধ্য থেকে কীভাবেই বা যোগ্যতর প্রার্থীকে তাদের কাজের জন্য বেছে নেবেন? সুতরাং এমন একটি ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা দরকার, যাতে মেধাবী লোকটিকে সহজেই খুঁজে বের করা যায় এবং পরীক্ষায় নকলের কোন প্রয়োজনই না পড়ে।

প্রথমেই আলোচনা করা যায়, পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা কেন নকলের আশ্রয় নেয়। কেন তারা ক্লাসরুমে শিক্ষাঙ্গনে এমন শিক্ষা পায় না যাতে তারা সহজেই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। এই প্রশ্নটি প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

একথা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ পর্যন্ত কোথায়ও ক্লাসরুমে যথাযথ পড়শোনা হয় না। সকল শিক্ষকের কথা বলতে চাই না, সাধারণভাবে বলতে চাই, তাঁরা ক্লাসরুমে পড়ানোতে যতটা মনোযোগী, তার চেয়ে অধিক মনোযোগী প্রাইভেট শিক্ষকতার প্রতি। ফলে ক্লাসে যতটুকু শ্রম তারা দিতে পারেন, ততটুকু শ্রম তারা দেন না। অপেক্ষা করেন, ছাত্ররা আসুক তার কাছে প্রাইভেট পড়তে। ফলে ক্লাসরুমের শিক্ষা তাঁদের কাছে গৌণ হয়ে থাকে।

এ জন্য শুধু শিক্ষকদের দোষারোপ করাও সঙ্গত নয়। কারণ, আমাদের দেশের শিক্ষকরাও সমাজের সাধারণ মানুষই। তাঁদেরও সংসার আছে, সন্তান-সন্ততি আছে, লেখাপড়া আছে— তাদেরও অর্থের প্রয়োজন আছে। সে কারণেই তাঁরা অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য প্রাইভেট পড়ান। কিন্তু একথা তো বিস্মৃত হলে চলে না যে, মহান পেশা শিক্ষকতার মূল দায়িত্ব ক্লাসরুমেই ছাত্রদের পড়ানো। প্রতিটি ছাত্রের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে কিংবা অবনতি সম্পর্কে শিক্ষকরাই তো খেয়াল রাখবেন। যদি তিনি দেখেন পিছিয়ে পড়ছে কোন ছাত্র, তা হলে বিশেষ যত্নে তাকে সমানে সমানে তুলে আনাও তো শিক্ষকেরই দায়িত্ব। আমরা আমাদের শিক্ষক সমাজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, সেই দায়িত্ব কি আপনারা সঠিকভাবে পালন করছেন? কেবল ক্লাসে লেকচার দিয়ে কি এই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন সম্ভব? ছাত্রদের যতটুকু শেখালেন, ততটুকু তারা ঠিক শিখল কিনা, সেটা দেখার দায়িত্বও শিক্ষকদের গ্রহণ করতে হবে। যতদিন তারা এই দায়িত্ব গ্রহণ না করবেন, ততদিন পরীক্ষায় নকল প্রবণতা দূর করা যাবে বলে মনে হয় না।

পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের দিক থেকেও সমস্যা আছে। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিষয়ে কাম্য নম্বর না পাওয়ার অর্থ হচ্ছে একটি বছর নষ্ট হয়ে যাওয়া। একজন ছাত্রের এক বছরের জন্য পিছিয়ে যাওয়া। ফলে এই পরিস্থিতি এড়াতে শিক্ষার্থীরা কখনও কখনও মরিয়া হয়ে নকলের আশ্রয় গ্রহণ করে। পরীক্ষা এবং এর পাস পদ্ধতিকে যদি ঢেলে সাজানো যায়, তাহলেও এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে বলে মনে করি।

ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ক্রেডিট আওয়ার পদ্ধতির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কিংবা যে যে-বিষয়ে পাস করেছে সে বিষয়ে পাস ধরে নিয়ে অন্যান্য বিষয়ে অব্যাহতভাবে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দিয়ে তার পাস করবার পথ প্রশস্ত করা যায়। এতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পাস করতে হয়ত সময় বেশী লাগবে, কিন্তু সে সময়ের ব্যাপারটা তাকে মেনে নিতেই হবে। তাতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকবে যে, বিলম্বে হলেও তার পাস করার পথ কখনও রুদ্ধ হয়ে যাবে না। পাশাপাশি এভাবে বিলম্বিত সময় নিয়ে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন ভেদরেখা টানাও সঙ্গত হবে না। একইভাবে কোন পরীক্ষার্থী যদি তার পরীক্ষার ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয়, তবে তাকে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার সুযোগ দেখা যায়। যাতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী তার মেধা শাণিত করে তোলার সুযোগ পায়।

এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলে সার্টিফিকেট বা মার্কশীটের মাধ্যমে মেধা যাচাই করলেও ভুল হবার বা অবিচারের আশঙ্কা হ্রাস পাবে।

তবে এ আয়োজন হতে হবে সামগ্রিক। আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এখনও সীমিত। তারপরও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়ের অভাবে শত শত সীট শেষ পর্যন্ত খালিই থেকে যায়। এক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরী।

এই সকল বিষয় সমন্বয়ের মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে পরীক্ষা বিষয়টি ঢেলে সাজানো দরকার। এব্যাপারে শীগগীরই ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষায় রূপান্তর করা হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

— রেজোয়ান সিদ্দিকী

দৈনিক বাংলা